ইউনিট ১৩

বাংলাদেশের শিল্প

ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত। সরকার এই খাতের প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সময়ে নানারূপ নীতি গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই খাতে আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি হয়নি। এজন্য জাতীয় আয়ে এই খাতের অবদান প্রায় অপরিবর্তিত আছে। এ ইউনিটে বাংলাদেশের শিল্পের কতিপয় উল্লেখযোগ্য বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা করা হবে।

পাঠ- ১ বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বৃহদায়তন শিল্প সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ক্ষুদ্র শিল্প সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- কুটির শিল্পের কাঠামো সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বৃহদায়তন শিল্প

বাংলাদেশের শিল্পখাতে প্রধানত: তিন শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বৃহদায়তন শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটির শিল্প। তবে এ তিন শ্রেণীর শিল্পের কোন সঙ্গতিপূর্ণ সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বৃহদায়তন শিল্পের উপাত্ত সংগ্রহ করে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর সংজ্ঞা অনুসারে ১০ জন বা এর বেশি শ্রমিক নিয়োগ করে এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বৃহদায়তন শিল্প বলা যায়। এই শ্রেণীর শিল্পের মধ্যে মাঝারি শিল্পও অন্তর্ভুক্ত আছে।

ক্ষুদ্র শিল্প

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর উপাত্ত সংগ্রহ করে। এই সংস্থার সংজ্ঞা অনুসারে ১০ থেকে ২০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে এবং ২৫ লক্ষ টাকার কম স্থায়ী সম্পদ আছে এরূপ শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়। তবে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান ২০ জনের বেশি শ্রমিক থাকলেও যদি সে প্রতিষ্ঠান যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহার না করে তবে সেটিও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

কুটির শিল্প

যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে অধিকাংশ বা সবই পরিবারের লোক, আংশিকভাবে বা পূর্ণভাবে নিয়োজিত থাকে এবং যেগুলোতে ১০ জনের বেশি শ্রমিক কাজ করে না সেগুলোকে বুঝায়। তবে যান্ত্রিক শক্তি ব্যববার করে এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২০ জন পর্যন্ত শ্রমিক থাকলেও তা কুটির শিল্প হিসেবে বিবেচিত হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের শিল্প খাত এক জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি নয়। এর মধ্যে আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে আমদানিকৃত আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। আবার চিরায়ত প্রযুক্তি এবং পারিবারিক শ্রম ব্যবহৃত হয় এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য চলতি উপাত্ত পাওয়া মুশকিল। তবে যে উপাত্ত পাওয়া যায় তা থেকে দেখা যায় যে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ শিল্পখাতের জাতীয় আয়ে শতকরা ৬৫ ভাগ এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসমূহ শতকরা ৩৪ ভাগ অবদান রাখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের শিল্পখাতে শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে-

ক. তিন শ্রেণীর খ. দুই শ্রেণীর

গ. এক শ্রেণীর ঘ. উপরের একটিও নয়

২। কুটির শিল্পে নিয়োজিত অধিকাংশ শ্রমিক

ক. ভাড়াকুত শ্রমিক খ. পারিবারিক শ্রমিক

গ. বন্ধু-বান্ধব ঘ. উপরের একটিও নয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বৃহদায়তন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বলতে কি বুঝায়?

পাঠ- ২ বাংলাদেশের শিল্পের সমস্যা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের শিল্পের সমস্যা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশের শিল্পের সমস্যার সমাধান সম্পর্কে বলতে পরবেন।

বাংলাদেশের শিল্পের সমস্যা

বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সমস্যা দেখা যায়:

১. **দেশীয় অর্থনীতির ছোট আয়তন ঃ** বাংলাদেশের জাতীয় আয় কম। ফলে লোকের ক্রয় ক্ষমতা কম এবং এজন্য শিল্পদ্রব্যের বাজার ছোট। দেশীয় লোকের চাহিদা পূরণের জন্য যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান হয় তাদের দ্রব্যের চাহিদা কম বলে তাদের দ্রুত প্রবৃদ্ধি হয় না।

২. **পাটজাত দ্রব্যের হ্রাসমান চাহিদা ঃ** পাটজাত দ্রব্যের শিল্প বাংলাদেশের বৃহত্তম শিল্প ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। এ জন্য রপ্তানীমুখী এ শিল্পটির উৎপাদনও হ্রাস পাচ্ছে।

৩. **উদ্যোক্তার অভাব ঃ** বাংলাদেশে উদ্যোক্তা শ্রেণীর অভাব আছে। ব্রিটিশ শাসনকালে হিন্দু শ্রেণী ও পাকিস্তান আমলে পশ্চিম পাকিস্তানী ও উদ্বাস্তু উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশ হওয়ার পর শিল্প জাতীয়করণ করার ফলে উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে উঠেনি। ১৯৭০ দশকের শেষ দিক হতে উদ্যোক্তা শ্রেণী ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে।

৪. **অর্থ সংস্থানের অভাব ঃ** শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য ঋণের প্রয়োজন আছে। কিন্তু বাংলাদেশে শিল্প ঋণের পরিমাণ কম। পূর্বে কম সুদে শিল্প ঋণ প্রদানের অভিজ্ঞতা আবার দুঃখজনক। অনেক শিল্প উদ্যোক্ত ঋণ খেলাপী হয়েছেন। এখন বাজার নির্ধারিত সুদের হারে ঋণ দেয়া হয়।

৫. **দুর্বল অবকাঠামো ঃ** বাংলাদেশের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো পর্যাপ্ত নয়। বিশেষতঃ বিদ্যুৎ সরবরাহে লোড শেডিং, ভোল্টেজ উঠানামা ইত্যাদি কারণে শিল্প উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হয়। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ, গ্যাস সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কাছে ন্যস্ত এবং এসবের সার্বিক সেবার মান অত্যন্ত নিম্ন।

৬. **মানব সম্পদের স্বল্পতা ঃ** শিল্পায়ন যত অগ্রসর হয়ে ততই দক্ষ শ্রমিক শ্রেণীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাংলাদেশ শিক্ষার হার কম এবং কারিগরী ও পেশাগত শিক্ষার পরিমাণ আরো কম। তদুপরি নানাবিধ কারণে শিক্ষার মানও নিচু। এজন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ শ্রমিক শ্রেণীর অভাব দেখা যায়।

৭. **প্রযুক্তির পশ্চাদপদতা ঃ** শিল্প উন্নয়নের একটি বড় নিয়ামক হল প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। কিন্তু বাংলাদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে পণ্যের মান উন্নয়ন, উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন, শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি বা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা করা হয় না বললেই চলে। জাতীয় পর্যায়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন বা বিদেশ থেকে লব্ধ প্রযুক্তি দেশের অবস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধনের জন্য যে গবেষণা হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় কম।

৮. **সরকারী নীতি ঃ** এক সময় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য সরকারী নীতিমালা, বাণিজ্যনীতি ইত্যাদি ব্যক্তিগত খাতের উন্নয়নের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করত। ১৯৮০ -এর দশক থেকে শিল্প ও বাণিজ্যনীতি ক্রমে উদারীকরণের ফলে এসব বিঘ্ন অনেকাংশে দূর হয়েছে।

৯. **শ্রমিক অসন্তোষ ঃ** বাংলাদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিক অসন্তোষ লেগেই আছে। এর ফলে বিনিয়োগ নিরূৎসাহিত হয়।

শিল্পের সমস্যার সমাধান

বাংলাদেশে শিল্পের সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ নেয়া যায়ঃ

১. **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি ঃ** দেশের জনগণের শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষমতা যাতে বৃদ্ধি পায় সেজন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এজন্য কৃষি ও গ্রামীণ খাতে সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। গ্রামের জনগণ সাধারণত: দেশীয় পণ্য বেশি কেনে।

২. **উদ্যোক্তা শ্রেণী ঃ** দেশে যাতে ব্যক্তিগত খাতে একটি উদ্যেঅক্তা শ্রেণী গড়ে উঠে সেজন্য সরকার ও ব্যক্তিগত খাতের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা থাকা দরকার। ব্যক্তিগত খাতের বিকাশ পথে অন্তরায় হয় এরূপ আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও সরকারী আইন কানুন দূর করা দরকার।

৩. **অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা ঃ** শিল্পখাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থসংস্থান বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া দরকার। জনগণের সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন রকম সঞ্চয়ের মাধ্যম তৈরি করা দরকার। দেশে যে কালো টাকা আছে তা শিল্পখাতে বিনিয়োগের জন্য উৎসাহ দেয়া দরকার। বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

৪. **অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঃ** অবকাঠামোর উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরী। টেলিযোগাযোগ, সড়ক, বন্দর, অভ্যন্তরীণ, নৌ-চলাচল প্রভৃতির উন্নতির জন্য সরকারী ও ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা দরকার। বিশেষত: বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর নিয়মিত ও নির্ভরযোগ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

৫. **মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ** দক্ষ শ্রমিকের সরবরাহ বৃদ্ধির করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষত কারিগরী ও পেশাগত শিক্ষার প্রসার ও মান বৃদ্ধি করার জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৬. **প্রযুক্তির উন্নয়ন ঃ** দেশীয় প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং আমদানিকৃত প্রযুক্তি দেশীয় অবস্থার সঙ্গে সমন্বিত করার জন্য প্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা দরকার।

৭. **শ্রমিক অসন্তোষ ঃ** শ্রমিক অসন্তোষ দূর কার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা শ্রমিক-সরকার সম্পর্কের উন্নতি হওয়া দরকার। এজন্য আইন সংশোধন করা যায়।

৮. **শিল্প উন্নয়নের পরিবেশ তৈরি ঃ** দেশে উন্নয়নের পরিবেশ তৈরির জন্য রাজনৈতিক কারণে ঘন ঘন হরতাল-ধর্মঘট বন্ধ করার দরকার এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করা দরকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্বক্তিক প্রশ্ন

১। নিচের কোটি বাংলাদেশের শিল্পের সমস্যা নয়?

ক. উদ্যোক্তার অভাব খ. দুর্বল অবকাঠামো
গ. বন্যা ও খরা ঘ. শ্রমিক অসন্তোষ

২। বাংলাদেশের শিল্পের সমস্যা সমাধানের জন্য কোন ব্যবস্থাটি নেয়া যেতে পারে?

ক. প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি খ. অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা
গ. উন্নয়নের পরিবেশ তৈরি ঘ. উপরের সব কটি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শিল্পের চারটি সমস্যা লিখুন।

২. শিল্পের সমস্যা সমাধানের চারটি উপায় লিখুন।

পাঠ- ৩ বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব

বাংলাদেশে যে তিন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান দেখা যায় তার মধ্যে মূলধন ও উৎপাদনের দিক থেকে বৃহৎ শিল্প সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলঃ

১। **জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ঃ** বৃহৎ শিল্পে শ্রমিক প্রতি মূল্য সংযোজনের পরিমাণ বেশি। সুতরাং বৃহৎ শিল্প জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে বেশি অবদান রাখে।

২। **কৃষি উন্নয়ন ঃ** কোন কোন বৃহৎ শিল্প কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাত করে। যেমন- পাট, চা, চিনি, সিগারেট ইত্যাদি। এসব শিল্পের উন্নতি হলে কাঁচামালের ব্যবহার বাড়বে এবং ফলে কৃষির উন্নতি হবে।

৩। **প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ঃ** বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক শিল্পগুলো বৃহৎ শিল্প। যেমন- সার, সিমেন্ট, চীনামাটির পাত্র ইত্যাদি শিল্প। এসব শিল্পের উন্নয়ন হলে দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার হবে।

৪। **রপ্তানী বৃদ্ধি ঃ** রপ্তানিমুখী শিল্পের অনেকগুলোই বৃহৎ শিল্প। যেমন- পোশাক, চামড়া, চিংড়ী, চীনামাটির পাত্র বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি। বৃহৎ শিল্পের দেশের রপ্তানী বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৫। **প্রযুক্তির উন্নয়ন ঃ** বৃহৎ শিল্পে সাধারণতঃ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ এই প্রযুক্তির অনুসরণে উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহার করে। ফলে প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটে।

৬। **দক্ষ শ্রমিক শ্রেণী ঃ** বৃহৎ শিল্পে সাধারণতঃ দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। এর ফলে দেশে একটি দক্ষ শ্রমিক শ্রেণী গড়ে ওঠার সুযোগ পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব নয় কোনটি?

ক. জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি খ. কুটির শিল্পের উন্নতি
গ. রপ্তানি বৃদ্ধি ঘ. প্রযুক্তির উন্নয়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব আলোচনা কর।

পাঠ- ৪ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের পাট শিল্প, কার্পাস বয়ন শিল্প, পোশাক শিল্প, সার শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, কাগজ শিল্প, চিনি শিল্প, চা শিল্পের উৎপাদন, বন্টন, বাণিজ্য সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে বলতে পারবেন।

পাট শিল্প ঃ পাট শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান শিল্প। এটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের বেকার সমস্যার সমাধান, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং অথ্যনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উৎপাদন ঃ বর্তমানে এদেশে প্রায় ২৪ হাজার তাঁত বিশিষ্ট ৭৮টি পাটকল আছে। তবে চালু পাটকলের সংখ্যা ৭৪টি। ১৯৯৮-৯৯ সালে ৮৭৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা মূল্রের ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার মে.টন পাটজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। ১৯৯৯-২০০০ সালে পাটকলগুলোতে প্রায় ৩.৪২ লক্ষ মে.টন পাটজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়েছে। নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৩৭৪ জন।

বিগত কয়েক বছরের পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন নিচের সারণিতে দেখান হলঃ

বিভিন্ন বছরের পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন:

পাটকলে ব্যবহৃত কাঁচা পাট ও উৎপন্ন পাটজাত দ্রব্য

বছর	ব্যবহৃত কাঁচা পাট (লক্ষ মে.টন হিসেবে)	উৎপন্ন পাটজাত দ্রব্য (লক্ষ মে.টন হিসেবে)	উৎপন্ন পাটজাত দ্রব্যের মূল্য (মিলিয়ন টাকা হিসেবে)
১৯৯৩-৯৪	৪.৬০	৪.২১	১০৩২.৪০
১৯৯৪-৯৫	৪.৮৬	৪.২৫	১৩২২.৮০
১৯৯৫-৯৬	৪.৮৮	৪.০৫	১২১০.৫০
১৯৯৬-৯৭	৪.৫০	৪.০৫	৯৯৯.৩০
১৯৯৭-৯৮	৪.৬০	৪.১১	১১২৮.৬০
১৯৯৮-৯৯	৩.৮১	৩.৬৯	৮৭৬.৪০

উৎস ঃ বাংলাদেশ মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন, নভেম্বর, ১৯৯৯; পৃঃ ৬৩

বর্তমানে পাটকলগুলো চট, থলে, বস্তা, দড়ি, ত্রিপল, ক্যানভাস, তাঁবু, কাপড় ইত্যাদি দ্রব্য উৎপাদন করছে। এ দ্রব্যসমূহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ; যেমন- ব্রিটেন, রাশিয়া, বুলগেরিয়া, লিবিয়া, ইতালি, ফ্রান্স, জাপান, মিসর, কানাডা প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

বাংলাদেশের পাট শিল্পের বণ্টন ঃ বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পাটকলতটি হল নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুট মিল। যার প্রতিষ্ঠা ১৯৫১ সালে। স্বাধীনতার পর হতে এ যাবৎ পাটকলের সংখ্যা ৭৮টি। বণ্টনের ভিত্তিতে বাংলাদেশের পাট শিল্পকে ৪টি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যথা:

১. ঢাকা অঞ্চল, ২. চট্টগ্রাম অঞ্চল, ৩. খুলনা অঞ্চল ও ৪. রাজশাহী অঞ্চল।

১. ঢাকা অঞ্চল ঃ বাংলাদেশের মোট পাটকলের মধ্যে ৪০টি ঢাকা অঞ্চলে। তার মধ্যে বাংলাদেশের প্রধান পাট কেন্দ্র হল নারায়ণগঞ্জ। এক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জে ৯টি, কাঞ্চনে ৫টি, ঘোড়াশালে ৪টি, পলাশে ৩টি ও ডেমরায় ৩টি পাটকল স্থাপিত হয়। পাটকলগুলো বেশিরভাগ শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত।

১. জেলাভিত্তিক সংখ্যা হল ঢাকা জেলায় ৩৬টি, ময়মনসিংহ জেলায় ২টি, জামালপুরে ১টি এবং ফরিদপুরে ১টি।

২. **চট্টগ্রাম অঞ্চল ঃ** এ অঞ্চলে ২১টি পাটকল আছে। জেলাভিত্তিক পাটকলের মধ্যে চট্টগ্রাম জেলা ও তার আশপাশে ১৭টি পাটকল, কুমিল্লা জেলায় ৩টি, নোয়াখালী জেলায় ১টি।

৩. **খুলনা অঞ্চল ঃ** খুলনা অঞ্চলে মোট ১৫টি পাটকল আছে। এর মধ্যে খুলনা ও তার আশপাশে ১১টি পাটকল এবং যশোর জেলায় ৪টি পাটকল অবস্থিত।

৪. **রাজশাহী অঞ্চল ঃ** রাজশাহী অঞ্চল পাটকল স্থাপনের উপযুক্ত নয়। ফলে পাট শিল্পে অনুন্নত। এখানে মাত্র ২টি পাটকল আছে। তার মধ্যে রাজশাহী জেলায় ১টি আর পাবনা জেলায় ১টি।

নিচে বিভাগ ও জেলাভিত্তিক পাট শিল্পের বণ্টন তালিকার সাহায্যে দেখানো হল:

অঞ্চল	জেলা	পাটকলের সংখ্যা	মোট পাটকল
ঢাকা	ঢাকা ময়মনসিংহ জামালপুর ফরিদপুর	৩৬ ২ ১ ১	৪০
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম কুমিল্লা নোয়াখালী	১৭ ৩ ১	২১
খুলনা	খুলনা যশোর	১১ ৪	১৫
রাজশাহী	রাজশাহী পাবনা	১ ১	২

বাংলাদেশে পাট শিল্পের স্থানীয়করণের কারণ ঃ বাংলাদেশে পাট শিল্প বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণে গড়ে উঠেছে। কারণগুলো নিম্নরূপঃ

(ক) প্রাকৃতিক কারণ

১. **কাঁচামালের সহজলভ্যতা ঃ** পাটই পাট শিল্পের একমাত্র কাঁচামাল। ফলে পাট শিল্পের কাঁচামাল পাট সহজে ও সস্তায় পাওয়া সম্ভব বলে বাংলাদেশে পাট শিল্প গড়ে উঠেছে।

২. **উপযুক্ত জলবায়ু ঃ** বাংলাদেশের উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু পাট শিল্প গড়ে উঠার জন্য অনুকূল।

৩. **শক্তিসম্পদের প্রাপ্তি ঃ** বাংলাদেশে পাট শিল্প গড়ে উঠার পিছনে আর একটি কারণ হল শক্তিসম্পদ; যেমন- গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদির প্রাপ্যতা।

(খ) অর্থনৈতিক কারণ

১. **শ্রমিকের সহজলভ্যতা ঃ** পাট শিল্পের জন্য বহুসংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন। বাংলাদেশ পাট শিল্পের উপযুক্ত প্রচুর শ্রমিক স্বল্প খরচে পাওয়া যায় বলে পাট শিল্প গড়ে উঠেছে।

২. **মূলধন সরবরাহ ঃ** বাংলাদেশে পাট শিল্পের জন্য মোটামুটি মূলধন সরবরাহ করা হয়। ফলে পাট শিল্প গড়ে উঠছে।

৩. **যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ** বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই পাট উৎপাদন হয়। ফলে নদীপথে এবং স্থলপথে পাট শিল্পের আশপাশ হতে খুব দ্রুত পাট সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

৪. **ব্যাপক চাহিদা ঃ** বিদেশে পাটজাত দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা থাকায় পাট শিল্প স্থাপন লাভজনক। ফলে বাংলাদেশে পাট শিল্পের স্থানীয়করণ হয়।

৫. **সরকারি উদ্যোগ ঃ** বাংলাদেশে পাট শিল্প গড়ে উঠার পিছনে সরাসরি ব্যাপক সরকারি উদ্যোগ বিশেষভাবে সহায়তা করে।

উপসংহার ঃ বর্তমানে পাট শিল্প বিশ্ববাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। সিনথেটিক দ্রব্যের প্রভাবে বিশ্ববাজারে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা কমে গেছে। তবুও বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের ১৯% বৈদেশিক মুদ্রা পাট খাত থেকে আসে। এজন্য দেশের অর্থনীতিতে পাট শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশের কার্পাস বয়ন

কার্পাস বয়নশিল্প ঃ কার্পাস বয়নশিল্প বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান শিল্প। এ শিল্প অভ্যন্তরীণ ভোগমুখী শিল্প। আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর নির্ভর করে বাংলাদেশে এ শিল্প গড়ে উঠেছে। তবে বাংলাদেশে বর্তমানে কিছু তুলা উৎপাদন হচ্ছে। দৈনন্দিন জীবনে মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে খাদ্যের পরেই বস্ত্রের স্থান। কিন্তু বাংলাদেশ বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ৬৫টি বস্ত্রকল ও সুতা কল রয়েছে। ১৯৪৭ সালে এর সংখ্যা ছিল ৮টি। বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পগুলোতে মোট প্রায় ১০ লক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত আছে।

বস্ত্র উৎপাদন ঃ বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্প একটি অভ্যন্তরীণ ভোগমুখী শিল্প। এদেশের চাহিদা পূরণে বস্ত্র শিল্পগুলো সক্ষম নয়। প্রতিবছর প্রায় ৫০%-৫৫% কাপড় ঘাটতি পড়ে যা বিদেশ হতে আমদানি করতে হয়। বস্ত্র কলগুলো দেশের চাহিদার মাত্র ৫০% উৎপাদন করতে সক্ষম। বাংলাদেশে মোট কাপড়ের চাহিদা ১১০ কোটি গজ সেখানে বস্ত্রকলগুলোতে এবং হস্ত পরিচালিত তাঁতগুলোতে উৎপাদন হয় বছরে ৫৯-৬০ কোটি গজের মত।
নিচে কয়েক বছরের কার্পাস বয়ন শিল্পে উৎপাদিত বস্ত্রের পরিমাণ দেয়া হল:

কার্পাস বস্ত্র উৎপাদন

সাল	সুতা উৎপাদন (মিলিয়ন কেজি)	কাপড় (মিলিয়ন মি.)
১৯৯৪-৯৫	৪৯.১০	১৭.০০
১৯৯৫-৯৬	৪৯.৯০	১০.২৮
১৯৯৬-৯৭	৫০.১৬	১০.৯০
১৯৯৭-৯৮	৫৩.০৬	১০.৪২
১৯৯৮-৯৯	৫৩.২৪	১০.৫৬
১৯৯৯-২০০০	৫৭.৩৪	১১.৮১

উৎস ঃ বাংলাদেশ মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন, আগস্ট ২০০০, পৃঃ ৬২

কার্পাস বয়নশিল্পের বণ্টন ঃ বাংলাদেশের কার্পাস বয়নশিল্প বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। আলোচনার সুবিধার জন্য অঞ্চলসমূহকে ৪টি অঞ্চলে ভাগ করা যায়ঃ
১. ঢাকা অঞ্চল, ২. চট্টগ্রাম অঞ্চল, ৩. কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চল ও ৪. অন্যান্য অঞ্চল।

১. **ঢাকা অঞ্চল ঃ** সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থা, দক্ষ শ্রমিকের সুলভ যোগান, মূলধন সরবরাহ ইত্যাদি কারণে ঢাকা অঞ্চলে ২৫টি কার্পাস বয়নশিল্প গড়ে উঠেছে। ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী, নরসিংদী, কালিগঞ্জ, ডেমরা, কাঁচপুর, মুড়াপাড়া, ফতুল্লা, শ্যামপুর, সাভার, গাজীপুর, মিরেরবাগ ইত্যাদি প্রধান বস্ত্রশিল্প কেন্দ্র।
২. **চট্টগ্রাম অঞ্চল ঃ** চট্টগ্রাম অঞ্চলে ১০টি বস্ত্র শিল্প আছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের মধ্যে প্রধান শিল্পকেন্দ্রগুলো ফেওজদার হাট, হালিশহর, ষোলশহর, পাঁলাইশ, পাথরঘাটা ইত্যাদি।
৩. **কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চল ঃ** এখানে ৮টি বস্ত্র শিল্পকেন্দ্র আছে। স্থানগুলো হল বাঞ্ছারামপুর, দুর্গাপুর, দৌলতপুর, হালিমানগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লক্ষ্মীপুর, ফেনী ইত্যাদি।
৪. **অন্যান্য অঞ্চল ঃ** উপরোক্ত বস্ত্রকলগুলো ছাড়াও বাংলাদেশে বিক্ষিপ্তভাবে কতকগুলো বস্ত্রকল আছে। যেমনঃ পাবনা জেলায় ৩টি, যশোর জেলায় ২টি, বগুড়া জেলায় ১টি, টাঙ্গাইলে ১টি, খুলনায় ১টি, বরিশালে ১টি, বরিশালে ১টি, কিশোরগঞ্জে ১টি, ফরিদপুরে ১টি, রাজশাহীতে ১টি ও রংপুরে ১টি করে কার্পাস বয়নশিল্প স্থাপিত হয়েছে।

কার্পাস বয়নশিল্পের স্থানীয়করণ ঃ নীচে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কার্পাস বয়নশিল্পের স্থানীয়করণের কারণসমূহ দেয়া হলঃ

(ক) প্রাকৃতিক কারণ

১. **জলবায়ু ঃ** কার্পাস বয়নশিল্প গড়ে উঠার জন্য আর্দ্র জলবায়ুর প্রয়োজন। বাংলাদেশের জলবায়ু উপযুক্ত আর্দ্র হওয়ার কারণে এখানে বয়নশিল্পের জন্য উপযুক্ত।

২. **কাঁচামাল ঃ** বিদেশ হতে সহজেই বয়নশিল্পের উপযুক্ত কাঁচামাল সুতা আমদানি করা সম্ভব হয় বলে এখানে বয়নশিল্প গড়ে উঠেছে।

৩. **শক্তিসম্পদ ঃ** বয়নশিল্প গড়ে উঠার মত পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ও গ্যাস শক্তি হিসেবে পাওয়া যায় বলে এখানে বয়নশিল্প গড়ে উঠেছে।

(খ) অর্থনৈতিক কারণ

১. **শ্রমিক প্রাপ্তি ঃ** বয়নশিল্পের উপযুক্ত দক্ষ শ্রমিকের সহজ প্রাপ্তির কারণে বাংলাদেশে বয়নশিল্প উন্নতি লাভ করেছে।

২. **মূলধন ঃ** বয়নশিল্পের জন্য সহজ শর্তে ঋণ সরবরাহ করা হয় বলে এখানে বয়নশিল্প গড়ে উঠা সহজ।

৩. **সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ঃ** বর্তমানে সরকার বয়নশিল্পের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছে ফলে তা বয়নশিল্প উন্নতির সহায়ক।

৪. **যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা ঃ** সমুদ্রপথে বিদেশ হতে কাঁচামাল আমদানি এবং বস্ত্রকলগুলোর সাথে অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা মোটামুটি উন্নত হওয়ায় এখানে কার্পাস বয়নশিল্প গড়ে উঠেছে।

৫. **বাজারের বিস্তৃতি ঃ** বস্ত্র ও সুতা প্রয়োজনীয় বলে এর চাহিদা সারাদেশে রয়েছে। বাজারের বিস্তৃতি শিল্প স্থাপনের একটি অন্যতম কারণ।

৬. **প্রযুক্তি ঃ** বাংলাদেশের বয়নশিল্প ঐতিহ্যবাহী। এখানে শ্রমিক পাওয়া যায় বলে শিল্প স্থাপন সহজ হয়েছে।

পোশাক শিল্প ঃ তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের শিল্পায়নে এক নতুন সম্ভাবনাময় সংযোজন। ১৯৭৭ সালে বেসরকারি উদ্যোগে মুষ্টিমেয় পোশাক তৈরি প্রতিসআন নিয়ে এদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের সূচনা। বর্তমানে দেশে ১৩২৭টি পোশাক শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে। পোশাক শিল্পে নিয়োজিত মোট শ্রমিকের ৯০%ই মহিলা। সমাজের বেকার মহিলারা পোশাক শিল্পে কাজের সুযোগ পেয়ে সহায় ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। এজন্য বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। উপরন্তু মোট রপ্তানি আয়ে পোশাক শিল্পের অবদান ৫৬.০৬%। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প মূলত: একটি রপ্তানিমুখী শিল্প। বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের অন্যতম প্রধান ক্রেতা দেশ হল যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়া কানাডা, ইইসিভুক্ত দেশ, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোও আমাদের পোশাকের ক্রেতা দেশ।

পোশাক শিল্পের উৎপাদন ঃ ১৯৯৮-৯৯ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন পোশাক শিল্পে সর্বমোট ১৪৩২০.৮ কোটি টাকা মূল্যের প্রায় ৬৪.৭৮ মিলিয়ন ডজন তৈরি পোশাক উৎপন্ন হয়।

উৎপাদিত পোশাক ঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন পোশাক শিল্পের তৈরি পোশাকের মধ্যে জিন্স প্যান্স, স্কার্টস, জ্যাকেট, মেয়েদের ব্লাউজ, নিট ফেব্রিক-এর টি-সার্ট, ট্যাঙ্ক-টপস, সোয়েটার ও পুলভার, কার্ডিগ্যাস, কোট প্লেজার, ছেলে-মেয়েদের শার্ট ও প্যান্ট, জগি, স্যুট ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পোশাক উৎপাদন

সাল	পোশাক (মিলিয়ন ডজন)	মূল্য (কোটি টাকার)
১৯৯৩-৯৪	২৩.৯	৪৮০০
১৯৯৪-৯৫	২৮.৭	৭৩৭৬
১৯৯৫-৯৬	২৮.৯	৭৯৭০.৬
১৯৯৬-৯৭	৫৩.৪৫	৯৪৬৫.৭
১৯৯৭-৯৮	৬৫.৫৯	১২৯০০.২
১৯৯৮-৯৯	৬৪.৭৮	১২৯০০.২

উৎস ঃ বাংলাদেশ মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন, নভেঃ ৯৯ পৃঃ ৬৫

পোশাক শিল্পের বণ্টন ঃ পরিবেশ দূষণের ব্যাপকতা মুক্ত পোশাক শিল্প যেকোন এলাকায় স্থাপনের উপযোগী হওয়া সত্ত্বেও কাঁচামাল, পোশাক বাজারজাতকরণ, শ্রমিক প্রাপ্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি সুবিধাজনক অবস্থানের জন্য এ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো শহরকেন্দ্রিক গড়ে উঠেছে। এ কারণে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা প্রভৃতি বড় বড় শহর এলাকায় এ শিল্প অধিক গড়ে উঠেছে। যেমন:

(i) ঢাকা অঞ্চল ঃ পোশাক শিল্পে ঢাকা অঞ্চল প্রথম। এ অঞ্চলের প্রায় ৮০৬টি পোশাক শিল্পের মধ্যে প্রায় ৭৭৩টি ঢাকা শহরে এবং ৩৩টি নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত। ঢাকা মহানগরীর প্রায় সর্বত্রই এ শিল্প ছড়িয়ে রয়েছে। কোন কোন বহুতল ভবনে

একাধিক পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ঢাকা মহানগরীর রামপুরা, এলিফ্যান্ট রোড, গ্রীণরোড, মিরপুর-১, মিরপুর-১০, মিরপুর-১২, মগবাজার, বাংলামোটর, মহাখালি, বনানী প্রভৃতি অঞ্চলে এ শিল্প বেশি সংখ্যায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এছাড়া ফার্মগেট, মতিঝিল, শান্তিনগর, মোহাম্মদপুর, তেজগাঁও, গুলশান, উত্তরা প্রভৃতি স্থানেও এ শিল্প রয়েছে।

(ii) চট্টগ্রাম অঞ্চল ঃ পোশাক শিল্পে চট্টগ্রাম শহর দ্বিতীয়। এখানে প্রায় ৩৯০টি শিল্প অবস্থিত। এ শিল্প কেন্দ্রগুলো কালুরঘাট, আগ্রাবাদ, পাঁচলাইশ, নাসিরাবাদ, এনায়েত বাজার, ষোলশহর, বায়েজিদ বোস্তামী রোড প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত।

(iii) খুলনা ঃ খুলনা অঞ্চলের খুলনায় ২২টি এবং যশোরে ৯টি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান অবস্থিত।

রপ্তানি বাণিজ্য ঃ ১৯৯৮-৯৯ সালে বাংলাদেশ হতে ২৯৮ কোটি ৫০ লক্ষ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের প্রায় ৬৪.৭৮ মিলিয়ন ডজন পোশাক বিশ্ব বাজারে রপ্তানি করা হয়। এটি দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৫৬.০৬%।

পোশাক রপ্তানি বাণিজ্য

সাল	বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	পোশাক থেকে রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন)	রপ্তানি আয়ে পোশাকের অংশ (%)
১৯৯৩-৯৪	২৫৩৪	১২৯২	৫০.৯৮
১৯৯৪-৯৫	৩৪৭৩	১৮৩৫	৫২.৮৩
১৯৯৫-৯৬	৩৮৮২	১৯৪৯	৫০.২০
১৯৯৬-৯৭	৪৪২৭	২২৩৮	৫০.৫৫
১৯৯৭-৯৮	৫১৭.২০	২৮৪৩	৫৪.৯৭
১৯৯৮-৯৯	৫৩২.৪০	২৯৮৫	৫৬.০৬

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, জুন ২০০০ পৃঃ ১৭০।

রপ্তানিকৃত দেশসমূহ ঃ বর্তমানে বিশ্বের ২০টির অধিক দেশে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি হচ্ছে। তবে সবচেয়ে বেশি পোশাক রপ্তানি হয় যুক্তরাষ্ট্রে। তারপরেই রয়েছে জার্মানির স্থান। এরপর যথাক্রমে ফ্রান্স, ইটালি, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ড, কানাডা, বেলজিয়াম, স্পেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশ।

তৈরি পোশাক শিল্পের স্থানীয়করণের কারণসমূহ ঃ তৈরি পোশাক শিল্পের স্থানীয়করণের কারণসমূহ নিম্নরূপঃ

১. **শ্রমের সহজলভ্যতা ও স্বল্প মজুরি ঃ** বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের দ্রুত বিকাশের অন্যতম কারণ হল সস্তায় শ্রমের প্রচুর যোগান।

২. **স্বল্প মূলধন ঃ** পোশাক শিল্প স্থাপনের জন্য স্বল্প মূলধনের প্রয়োজন। ফলে উদ্যোক্তাগণ পোশাক শিল্প স্থাপনে উৎসাহবোধ করে।

৩. **বিনিয়োগ ও উৎপাদনের ব্যবধান কম ঃ** পোশাক শিল্পের জন্য তেমন যন্ত্রপাতি লাগে না। যা লাগে তা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করা সম্ভব। ফলে শিল্প স্থাপনের ৪০৬ মাসের মধ্যেই উৎপাদন করা সম্ভব। এজন্য এ শিল্প স্থাপন তুলনামূলক সহজ এবং স্বল্প সময়সাপেক্ষ।

৪. **দ্রুত শিল্পঋণ প্রাপ্যতা ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সহজ শর্তে গার্মেন্টস শিল্পগুলোকে ঋণ সরবরাহ করে থাকে। এতে শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তারা উৎসাহবোধ করে।

৫. **সরকারের উদার শিল্পনীতি ঃ** বিভিন্ন প্রকার কর রেয়াত, নিম্ন সুদের হার ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সরকার তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান করছে।

বাংলাদেশের সার শিল্প

ভূমিকা ঃ সার শিল্প বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে জমিতে প্রচুর পরিমাণে জৈব ও রাসায়নিক সার দিতে হয়। বাংলাদেশ রাসায়নিক সার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই স্থানীয় চাহিদা পূরণের জন্য বাংলাদেশকে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণ সার বিদেশ হতে আমদানি করতে হয়।

উৎপাদন ঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন সার কারখানায় ইউরিয়া, টি.এস.পি ও এ্যামোনিয়া সালফেট সার উৎপাদিত হয়ে থাকে। ১৯৯৮-৯৯ সালে বাংলাদেশে প্রায় ১৭৯৯.৩৬ হাজার মেট্রিকটন সার উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে ১৯৯৯-২০০০ সালে প্রায়

১৯০৪.০২ মে. টন সার উৎপাদিত হয়। নিচের তালিকায় বাংলাদেশে বিগত কয়েক বছরের সার উৎপাদনের পরিসংখ্যান প্রদত্ত হলঃ

চিত্র ১ ঃ বাংলাদেশের সার শিল্প

বাংলাদেশের সার উৎপাদন
(হাজার মে.টন)

সাল	পরিমাণ
১৯৯১-৯২	১৭৩৫.৬
১৯৯২-৯৩	২০৫০.৬
১৯৯৩-৯৪	২৩৬৬.১
১৯৯৪-৯৫	২১৪৪.৯
১৯৯৫-৯৬	২২৪৮
১৯৯৬-৯৭	১৭৭২.৬৬
১৯৯৭-৯৮	২০৩০.৬৭
১৯৯৮-৯৯	১৭৯৯.৩৬
১৯৯৯-২০০০	১৯০৪.০২

উৎস ঃ বাংলাদেশ মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন, আগস্ট- ২০০০, পৃ: ৬৭

সার শিল্পের বণ্টন ঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সার শিল্পগুলো স্থাপিত হয়েছে। নিচে সার কারখানাগুলোর বর্ণনা দেয়া হল:

১. **ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা ঃ** ১৯৬১ সালে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে এ সার কারখানাটি স্থাপিত হয়টি বাংলাদেশের সর্বপ্রথম সার কারখানা। হরিপুরের প্রাকৃতিক গ্যাস এ কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রতিবছর এ কারখানা থেকে ১১৭ হাজার টন ইউরিয়া এবং ১২.৫ হাজার টন এ্যামোনিয়া সালফেট সার উৎপন্ন হয়।

২. **ঘোড়াশাল সার কারখানা ঃ** ১৯৭০ সালে নরসিংদী জেলার ঘোড়াশাল নামকস্থানে এ সার কারখানাটি স্থাপিত হয়। সার কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে তিতাস গ্যাস ব্যবহৃত হয়। এ কারখানাটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩.৪০ লক্ষ টন ইউরিয়া সার।

৩. **চট্টগ্রাম ট্রিপল সুপার ফসফেট সার কারখানা ঃ** এ সার কারখানাটি দুটি প্রকল্পবিশিষ্ট সার কারখানা। প্রথম প্রকল্পটি ১৯৬৮সালে চালু হয় দ্বিতীয় প্রকল্প পুনরায় ১৯৭৪ সালে চালু করা হয়। এর সর্বমোট বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১ লক্ষ ৫২ হাজার টন সার।

৪. **আশুগঞ্জ জিয়া সার কারখানা ঃ** ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ নামকস্থানে এটি অবস্থিত। এটি ১৯৮১ সালে উৎপাদন শুরু করে। এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে ৫,৩০,০০০ টন ইউনিয়া সার। এটিতে তিতাস গ্যাস কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া সার প্যাকিং এবং পলিথিনও তৈরি করা হয়।

৫. **চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানা ঃ** এটি চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত। এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫,৫০,০০০ টন ইউরিয়া অ্যামোনিয়া। বাখরাবাদের গ্যাস এর কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৬. **খুলনা ট্রিপল সুপার ফসফেট সার কারখানা ঃ** এ সার কারখানাটি খুলনাতে তৈরি করা হয়। এটি পাকিস্তান আমলে নির্মিত। এর উৎপাদন ক্ষমতা ৪,৬০,০০০ টন নাইট্রোজেন সার, ২,৭৫,০০০ টন টি.এস.পি.।

৭. **এ্যামোনিয়াম সালফেট কারখানা ঃ** বার্ষিক ১২,০০০ টন সার উৎপাদন ক্ষমতাবিশিষ্ট এ্যামোনিয়াম সালফেট কারখানাটি ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানার পাশেই নির্মিত হবে। ফেঞ্চুগঞ্জের চালু সার কারখানার উদ্বৃত্ত এ্যামোনিয়াই এ কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এ কারখানায় উৎপাদিত সার সিলেটের চা বাগানগুলোতে ব্যবহার করা হবে।

এছাড়াও জামালপুরের সরিষাবাড়ি এবং সিলেটের হবিগঞ্জে সার কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

বাণিজ্য ঃ বাংলাদেশ রাসায়নিক সার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই প্রতিবছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বাংলাদেশকে সার আমদানি করতে হয়। ১৯৯৮-৯৯ সালে বাংলাদেশ বিশ্ববাজার হতে ১২ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের সার আমদানি করে।

উপসংহার ঃ কৃষিপ্রধান এ বাংলাদেশ রাসায়নিক সার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। দেশে সারের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। নির্মাণাধীন কারখানাগুলোর নির্মাণ সম্পূর্ণ করে পুরোদমে সার উৎপাদন করলে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বাংলাদেশ প্রচুর পরিমাণ সার বিদেশে রপ্তানি করতে পারবে। এতে আমদানি খাতে যেমন প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় রোধ হবে অন্যদিকে সার রপ্তানি করে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্প

ভূমিকা ঃ বাংলাদেশ সিমেন্ট শিল্পে অনগ্রসর। প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাবে এদেশ সিমেন্ট শিল্পে উন্নতি লাভ করতে পারেনি। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় মাত্র ১টি সিমেন্ট কারখানা বাংলাদেশের অংশে পড়ে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ সরকার দেশের অভ্যন্তরের চাহিদা উপলব্ধি করে দেশে সিমেন্ট শিল্প স্থাপনের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগী হয়। ফলশ্র□তিতে *দেশে আরও ২টি সিমেন্ট শিল্প স্থাপিত করে।*

সিমেন্ট শিল্পের সহায়ক উপাদানসমূহ ঃ চুনাপাথর, কাদামাটি, জিপসাম প্রভৃতি সিমেন্ট শিল্পের প্রধান কাঁচামাল। যেসব দেশে এসব উপাদান বেশি পাওয়া যায় সেসব দেশ সিমেন্ট শিল্পে উন্নতি লাভ করেছে। বাংলাদেশে এসব কাঁচামালের অভাব রয়েছে। ফলে এদেশ সিমেন্ট শিল্পে তেমন উন্নতি লাভ করতে পারেনি।

সিমেন্ট শিল্পের উৎপাদন ঃ বর্তমানে বাংলাদেশে ৭টি সিমেন্ট কারখানা বিদ্যমান। এসব কারখানায় ১৯৯৮-৯৯ সালে ২৬৫ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা মূল্যের ৫৬০ হাজার ৫৬ মেট্রিকটন সিমেন্ট উৎপন্ন হয়। নিচে বিগত কয়েক বছরের সিমেন্ট উৎপাদনের পরিমাণ একটি তালিকার মাধ্যমে দেখানো হলঃ

বাংলাদেশের সিমেন্ট উৎপাদন

সাল	উৎপাদন (হাজার মেট্রিকটন)	সিমেন্টের মূল্য (কোটি টাকা হিসেবে)
১৯৯৩-৯৪	৩২৩.৬৭	১২৪.৭৬
১৯৯৪-৯৫	৩১৬.৪০৯	১২৭.০৫
১৯৯৫-৯৬	৪২৫.৬৯৬	১৯০.৪৮
১৯৯৬-৯৭	৬১০.৫০	২৫৫.৪৩
১৯৯৭-৯৮	৫৪২.৮২	২৫১.৩৬
১৯৯৮-৯৯	৫৬০.৫৬	২৬৬.৮১

উৎস ঃ মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন, জুলাই ১৯৯৮; পৃঃ ৬৯

চিত্র ২ ঃ বাংলাদেশের সিমেন্ট উৎপাদন

১. **ছাতক সিমেন্ট কারখানা ঃ** এ কারখানাটি দেশের প্রাচীনতম কারখানা। বর্তমানে এর উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার মে. টন। পূর্বে আমদানিকৃত চুনাপাথরের উপর ভিত্তি করে এটি চালু হয়েছিল। কারণ, চুনাপাথরই এর কাঁচামাল। বর্তমানে নিকটস্থ টাকেরঘাট ও বাগলি বাজারের চুনাপাথর কাঁচামাল হিসেবে বেশি ব্যবহৃত হয়। এর নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে। এখানে বার্ষিখ প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার টন সিমেন্ট উৎপন্ন হয়।

২. **চট্টগ্রাম সিমেন্ট কারখানা ঃ** ৬ লাখ টন ক্ষমতাসম্পন্ন চট্টগ্রামের সিমেন্ট কারখানাটি ১৯৭৫ সালে চালু হয়। বর্তমানে এ কারখানায় বার্ষিক ২১৫ লাখ টন সিমেন্ট উৎপন্ন হয় কারখানার জন্য বিদেশ হতে ক্লিংকার বা খণ্ড পাথর আমদানি করা হয়। প্রয়োজনবোধে সীতাকুন্ড ও সেন্টমার্টিন দ্বীপের চুনাপাথরও এ কারখানায় ব্যবহার করা যাবে।

৩. **জয়পুরহাট সিমেন্ট কারখানা ঃ** জয়পুরহাট জেলার জয়পুরহাটের এ কারখানাটিতে শীঘ্রই উৎপাদন শুরু হবে বলে আশা করা যায়। স্থানীয় অফুরন্ত চুনাপাথরই হবে এর প্রধান কাঁচামাল। এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা হবে প্রায় ৬ লক্ষ ৬০ হাজার টন।

৪. **কনফিডেন্স সিমেন্ট কারখানা ঃ** চট্টগ্রাম শহরের ২ কি.মি. উত্তরে সীতাকুণ্ডতে ব্যক্তিমালিকানায় ১.৮ লক্ষ মে.টন ক্ষতাসম্পন্ন এ কারখানাটি ১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারি *মাসে চালু হয়। আমদানিকৃত খণ্ড পাথর ও ফসফোজিপসাম এর* কাঁচামাল।

৫. **মংলা সিমেন্ট কারখানা ঃ** পাকিস্তানের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় ৪.৫ লক্ষ মে.টন ক্ষমতাসম্পন্ন এ কারখানাটি বাগেরহাটের মংলা বন্দরের নিকট সেনাকল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে ১৯৯৫ সালের জুন মাসে চালু হয়। আমদানিকৃত খণ্ড পাথরের উপর নির্ভর করে এটি নির্মিত হয়েছে।

৬. **মেঘনা সিমেন্ট কারখানা ঃ** আমদানিকৃত কাঁচামাল ও খণ্ড পাথরের উপর ভিত্তি করে বসুন্ধরা শিল্প গোষ্ঠীর উদ্যেঅগে ৩ লক্ষ মে.টন ক্ষতাসম্পন্ন এ কারখানাটিও মংলা বন্দরের নিকট স্থাপিত হয়। ১৯৯৫ সালের শেষ ভাগে এর বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়।

৭. **হুন্দাই সিমেন্ট কারখানা ঃ** দক্ষিণ কোরিয়ার হুন্দাই শিল্পগোষ্ঠীর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় ১.৮০ লক্ষ মে.টন ক্ষমতাসম্পন্ন এ কারখানাটিও নারায়ণগঞ্জ জেলার মেঘনা ঘাটের নিকট স্থাপিত হয়। আমদানিকৃত খণ্ড পাথর এর প্রধান কাঁচামাল। ১৯৯৬ সালের জুন মাসে এর উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়।

৮. **অন্যান্য ঃ** এছাড়া ১৮ হাজার ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি ছোট আকৃতির সিমেন্ট কারখানার একটি সুনামগঞ্জ জেলার আইনপুর ও কুমিল্লার দাউদকান্দিতে এবং ১.৮ লক্ষ মে.টন ক্ষমতাসম্পন্ন অপর একটি কারখানা যশোরে নির্মিত হয়েছে।

বাণিজ্য ঃ বাংলাদেশ সিমেন্ট উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বিশ্ববাজার হতে সিমেন্ট ক্রয় করতে হয়। ১৯৯৭-৯৮ সালে বাংলাদেশ ১৫ কোটি ২০ লক্ষ মার্কিন ডলার মূল্যের প্রায় ৩২ লক্ষ ৩৩ হাজার মে.টন সিমেন্ট আমদানি করে। আমদানিকৃত সিমেন্টের অধিকাংশই সংগ্রহ করা হয় কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভারত ও জাপান হতে।

সিমেন্ট আমদানি

সাল	সিমেন্টের পরিমাণ (লক্ষ টন হিসেবে)	আমদানিকৃত সিমেন্টের মূল্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার হিসেবে)
১৯৯৪-৯৫	২২.৮৯	১১.৬০
১৯৯৫-৯৬	২৯.৫৮	১৭.১০
১৯৯৬-৯৭	২২.১৮	১৫.৬০
১৯৯৭-৯৮	৩২.৩৩	১৫.২০
১৯৯৮-৯৯	২২.৩৫	১০.৫০

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা নভেম্বর, ২০০০ পৃঃ ১৭১

উপসংহার ঃ উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর নির্ভর করে এদেশে নতুন নতুন অনেক সিমেন্ট শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। আশা করা যায়, নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশ সিমেন্ট শিল্পে একটি অবস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশের কাগজ শিল্পের বিবরণ দাও

ভূমিকা ঃ বাংলাদেশ বর্তমানে কাগজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ১৯৫৩ সালে চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনায় "কর্ণফুলী পেপার মিলস" স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে কাগজ শিল্পের সূচনা।

বাংলাদেশে কাগজ শিল্পের স্থানীয়করণের কারণ ঃ বাংলাদেশে কাগজ শিল্পের স্থানীয়করণের কারণসমূহ নিচে ব্যাখ্যা করা হলঃ

(ক) প্রাকৃতিক কারণ ঃ প্রাকৃতিক কারণগুলো নিম্নরূপ

১. **কাঁচামাল সরবরাহ ঃ** কাঁচামালের জন্য যে বাঁশ, নরম কাঠ, ঘাস, আখের ছোবড়া, পাটখড়ি, পুরাতন কাপড় ইত্যাদির প্রয়োজন তা বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ফলে কাগজ শিল্পের স্থানীয়করণ হয়েছে।
২. **পানি সরবরাহ ঃ** কাগজ কলে ব্যবহৃত কাঠ ও মন্ড ধৌত করার জন্য প্রচুর স্বচ্ছ ও মিঠা পানির প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। ফলে পর্যাপ্ত পানির কারণে এখানে কাগজ শিল্পের স্থানীয়করণ হয়েছে।
৩. **শক্তিসম্পদের প্রাচুর্য ঃ** বাংলাদেশ প্রাকৃতিক গ্যাসে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বেশির ভাগ কাগজ শিল্পের প্রাকৃতিক গ্যাস ও পানিবিদ্যুৎ শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(খ) অর্থনেতিক কারণ ঃ অর্থনৈতিক কারণগুলো নিম্নরূপঃ
১. **মূলধন সরবরাহ ঃ** কাগজ মিল্পের জন্য পর্যাপ্ত মূলধন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সরবরাহ করা হয়। ফলে এ শিল্পের স্থানীয়করণ হয়েছে।
২. **সুলভ শ্রম ঃ** কাগজ শিল্পের উপযুক্ত দক্ষ শ্রমিক সস্তায় পাওয়া যায়। এ কারণে স্থানীয়করণ হয়েছে।
৩. **ব্যাপক চাহিদা ঃ** কাগজের বিপুল চাহিদা বাংলাদেশে এবং বিশ্বজোড়া থাকায় স্থানীয়করণ হয়েছে।

উৎপাদন ঃ বাংলাদেশের কাগজের কলগুলোতে প্রধানত: লেখার কাগজ, ছাপার কাগজ, প্যাকিং ও অন্যান্য কাগজ উৎপন্ন হয়ে থাকে। ১৯৯৮-৯৯ সালে বাংলাদেশে সর্বমোট ২১৭ কোটি ৫৪ খাল টাকা মূল্যের প্রায় ৫৯ হাজার ৯৮৬ মেট্রিকটন কাগজ উৎপন্ন হয়। এসব কাগজের মধ্যে রয়েছে লেখার কাগজ, ছাপার কাগজ, প্যাকিং ও অন্যান্য ধরনের কাগজ। এছাড়া ১৯৯৮-৯৯ সালে ১৫ লাখ ১৯ হাজার বর্গমিটার হার্ডবোর্ড এবং ১৩ লাখ ৪৮ হাজার বর্গমিটার পার্টিকেল বোর্ডও উৎপন্ন হয়। ১৯৯৯-২০০০ সালে মোট ৫৪.৯৮ হাজার মে.টন কাগজ উৎপন্ন হয়।

বাংলাদেশে কাগজ উৎপাদন

সাল	কাগজ (সর্ব প্রকার) (হাজার মেট্রিকটন হিসেবে)	উৎপন্ন কাগজের মূল্য (কোটি টাকা)
১৯৯৫-৯৬	৮২.৩৬	২৮২.৬৩
১৯৯৬-৯৭	৬৭.৫১	২৫১.১৩
১৯৯৭-৯৮	৪৫.৯১	২০৪.৯৭
১৯৯৮-৯৯	৫৯,৮৬	২১৭.৪৫

উৎস ঃ বাংলাদেশ মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন, জুলাই ১৯৯৮; পৃঃ ৬৬

হার্ডবোর্ড ও পার্টিকেল বোর্ড উৎপাদন

সাল	হার্ডবোর্ড (হাজার বগূ মিটার)	পার্টিকেল বোর্ড (হাজার বর্গ মিটার)
১৯৯৫-৯৬	১৭১৭	৯৯৬
১৯৯৬-৯৭	১৬৭৮	১১১৪
১৯৯৭-৯৮	১৫২৮	১২০৪
১৯৯৮-৯৯	১৫১৯	১৩৪৮

উৎস ঃ বাংলাদেশ মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন, নভেম্বর, ১৯৯৯; পৃঃ ৬৬

বণ্টন ঃ বাংলাদেশে ৮টি কাগজ ও বোর্ড মিল আছে। এদের মধ্যে ২টি আছে পার্বত্য চট্টগ্রামে, ১টি সিলেটে, ১টি পাবনায়, ২টি খুলনায়, ২টি ঢাকায়। নিচে বাংলাদেশের কাগজ ও বোর্ড মিলগুলোর বর্ণণা দেয়া হলঃ
১. **কর্ণফুলী কাগজ কল ঃ** ১৯৫৩ সালে চন্দ্রঘোনা নামকস্থানে কর্ণফুলী নদীর তীরে বাংলাদেশের এ বৃহত্তম কাগজের কলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই বাংলাদেশের প্রথম কাগজ কল। কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত বলে একে "কর্ণফুলী কাগজ কল" বলা হয়। প্রথম অবস্থায় কারখানাটির উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৩০ হাজার টন। বর্তমানে এর উৎপাদন ক্ষমতা ৬০ হাজার টনে উন্নীত করা হয়েছে। এখানে প্রধানত: লেখার কাগজ, ছাপার কাগজ, মোড়কের কাগজ, ক্রীম লেড; ব্যাংক বণ্ড, জেলার, পোস্টার প্রভৃতি কাগজ প্রস্তুত হয়।

চিত্র ৩ ঃ বাংলাদেশের কাগজ শিল্প

২. **খুলনা নিউজপ্রিন্ট কারখানা ঃ** ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৫৯ সালে সাবেক পি. আই. ডি. সি-র উদ্যোগে খুলনা শহরের অদূরে ভৈরব নদীর তীরে খালিশপুর নামকস্থানে একটি নিউজপ্রিন্ট কারখানা স্থাপন করা হয়। এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম কাগজ কল প্রথম অবস্থায় এর উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৩৫ হাজার মেট্রিকটন। পরে এর উৎপাদন ক্ষমতা ৬৮ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয়।

৩. **উত্তরবঙ্গ কাগজ কল ঃ** পাবনা জেলার পার্শ্ববর্তী পদ্মা নদীর তীরে পাকশীতে এ কাগজের কল স্থাপিত। ই.পি.আই.ডি.সি-এর উদ্যোগে ১৯৬৯ সালে এটি স্থাপিত। এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫.২৪ হাজার মে.টন।

৪. **সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস ঃ** সুনামগঞ্জের সুরমা নদীর তীরে ছাতকে এ মিলটি অবস্থিত। এ কারখানায় বার্ষিক ২০ হাজার টন উন্নতমানের লেখার কাগজ ও ৩০ হাজার টন মণ্ড উৎপাদন করা সম্ভব হয়।

৫. **বসুন্ধরা কাগজ কল ঃ** জার্মানি ও চীনের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় বসুন্ধরা শিল্পগোষ্ঠীর উদ্যোগে মেঘনা ঘাটের নিকট ৩০ হাজার মে.টন ক্ষমতাসম্পন্ন এ কাগজের কলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমদানিকৃত কাঁচামালের সাহায্যে এখানে মূলত: সাদা লেখার ও ছাপার কাগজ এবং সিগারেটের কাগজ তৈরি হবে।

৬. **মাগুরা কাগজ কল ঃ** মাগুরা কাগজ কল নামে এ কারখানাটিও মেঘনা ঘাটের নিকট ব্যক্তিমালিকানায় ১৯৯৭ সালে চালু হয়েছে। এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৯ হাজার মে.টন। স্থানীয় ও আমদানিকৃত কাঁচামাল ব্যবহার করে এখানে সাদা লেখার ও ছাপার কাগজ উৎপন্ন হয়।

অন্যান্য ঃ মেঘনা ঘাটের নিকট শাহজালাল কাগজ কল ছাড়া আরও কয়েকটি কাগজের কারখানার নির্মাণ করা হচ্ছে।

৭. **খুলনা হার্ডবোর্ড মিল ঃ** খুলনার খালিশপুরে এ মিল স্থাপিত। বর্তমানে এ মিল বার্ষিক প্রায় ১৭ লাখ বর্গমিটার হার্ডবোর্ড উৎপন্ন করে।

৮. **আদমজী বোর্ড মিল ঃ** আদমজী পাটকলের নিকটে অবস্থিত শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে এ কলটি স্থাপিত। এখানে বার্ষিক প্রায় ৫ হাজার ৬শ টন পার্টিকেল উৎপন্ন হয়।

৯. **বাংলাদেশ বোর্ড মিল ঃ** ঢাকা জেলার টঙ্গীতে এ মিলটি স্থাপিত। এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩,৫০০ টন।

১০. **কাপ্তাই হার্ডবোর্ড মিল ঃ** চট্টগ্রামের কাপ্তাই নামকস্থানে এটি অবস্থিত। এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ২,৫০০ টন।

১১. **সোনালী কাগজ ও বোর্ড কারখানা ঃ** ঢাকার অদূরে ডেমরা শিল্প এলাকায় ব্যক্তিমালিকানায় বার্ষিক ৯ হাজার মে.টন ক্ষমতাসম্পন্ন এ কাগজ ও বোর্ড কারখানাটি নির্মিত হয়।

কাগজের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঃ বর্তমানে বাংলাদেশ কাগজ ও কাগজ জাতীয় দ্রব্য উৎপাদনে কেবল স্বয়ংসম্পূর্ণই নয়, বরং রপ্তানি করতে সক্ষম। ভারত, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, বার্মা, নেপাল, ইরাক প্রভৃতি দেশ বাংলাদেশ হতে নিউজপ্রিন্ট, কাগজ, হার্ডবোর্ড ইত্যাদি আমদানি করে থাকে। তবে বিগত বছরগুলোতে কাগজের উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পাওয়ায় বাংলাদেশকে বিশ্ববাজার হতে প্রচুর কাগজ আমদানি করতে হয়।

উপসংহার ঃ পরিশেষে বলা যায়, যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান থাকার দরুন বাংলাদেশ কাগজ শিল্পে সমৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। তাই এ শিল্পে সমৃদ্ধি আনয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ একান্ত জরুরী।

বাংলাদেশের চা শিল্প

ভূমিকা ঃ বাংলাদেশ চা শিল্পে বেশ উন্নতি লাভ করেছে। প্রথমে বাগান হতে সবুজ পাতা সংগ্রহ করা হয়। তারপর বাগানের ভিতর অবস্থিত কারখানায় পাতাগুলো শুকিয়ে গুঁড়া করে চা প্রস্তুত করা হয়।বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১১৬টি চা কারখানা আছে। চা শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। বাংলাদেশের শতকরা ৯০ ভাগ চা কারখানা সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জের চা বাগানগুলোর ভিতরেই অবস্থিত এবং বাকি ১০ ভাগ চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত। এসব কারখানায় ১৯৯৯-২০০০ সালে ৫১.৩৪ হাজার মেট্রিকটন চা উৎপন্ন হয়।

চা শিল্পের উৎপাদন

সাল	কারখানার সংখ্যা	পরিমাণ হাজার (মেট্রিকটন হিসেবে)	মূল্য (কোটি টাকা হিসেবে)
১৯৯৩-৯৪	১১৬	৫১.৪১	২৫৭.২৯
১৯৯৪-৯৫	১১৬	৪৬.৯৯	১৯৯.১১
১৯৯৫-৯৬	১১৬	৫১.৪৬	২০৪.৮৬
১৯৯৬-৯৭	১১৬	৫৩.১৯	১৯৫.৩২
১৯৯৭-৯৮	১১৬	৫৩.৫২	২৮৫.২৯
১৯৯৮-৯৯	১১৬	৫৩.৫০	২৮৫.০০

উৎস ঃ বাংলাদেশ মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন নভেম্বর, ১৯৯৯; পৃঃ ৬০

সিলেট অঞ্চলে চা শিল্প গড়ে উঠার কারণসমূহ ঃ নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণসমূহের প্রভাবে দেশের অধিকাংশ চা কারখানা সিলেট অঞ্চলে অর্থাৎ সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জে গড়ে উঠেছে।

১. চা চাষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। কিন্তু গোড়ায় পানি জমে থাকলে চা গাছ মরে যায়। তাই সিলেট অঞ্চলের পাহাড়িয়া এলাকায় পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকায় দেশের অধিকাংশ চা সিলেট অঞ্চলেই জন্মে থাকে। চা -এর উপর ভিত্তি করে চা কারখানা স্থাপিত হয় বলে সিলেট অঞ্চল চা শিল্পে সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

২. চা শিল্পে অভিজ্ঞ ও নিপুণ সুলভ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। সিলেট অঞ্চলের চা বাগানগুলোর নিকটেই এ জাতীয় শ্রমিক পাওয়া যায়।

৩. সিলেট অঞ্চলের চা গুণে ও মানে উন্নত বলে দেশ-বিদেশের বাজারে এর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। ফলে সিলেট অঞ্চলে চা শিল্প প্রসার লাভ করেছে।

৪. সিলেট অঞ্চলের চা বাগানগুলোর সাথে দেশের অভ্যন্তর ও রপ্তানি বন্দরের সাথে সড়ক ও রেলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উত্তম।

উপরোক্ত কারণসমূহের প্রভাবে সিলেট অঞ্চলে অর্থাৎ সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় চা শিল্প কেন্দ্রীভূতভাবে গড়ে উঠেছে।

চিত্র ৪ ঃ বাংলাদেশের চা শিল্প

চা শিল্পের বণ্টন ঃ বাংলাদেশে ১৫টি চা বাগানকে কেন্দ্র করে ১৪৪টি চা কারখানা গড়ে উঠেছে। নিচে চা বাগান এবং কারখানার বণ্টন দেখানো হলঃ

স্থান	বাগানের সংখ্যা	কারখানার সংখ্যা
সিলেট	২০	১৩০
হবিগঞ্জ	২৩	
মৌলভীবাজার	৯১	
চট্টগ্রাম	২২	১৪
রাঙামাটি	১	
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১	
মোট=	১৫৮টি	১৪৪টি

বাণিজ্য ঃ চা শিল্পে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিশ্ববাজারে প্রচুর চা রপ্তানি করা হয়। ১৯৯৮-৯৯ সালে বাংলাদেশ ২৪ হাজার মেট্রিকটন চা রপ্তানি করে ৩ কোটি ৯০ লক্ষ মার্কিন ডলার মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। এ

চা-এর অধিকাংশই চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে বিদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বাংলাদেশি চা বোর্ড-এর প্রধান ক্রেতা।

উপসংহার ঃ বাংলাদেশ সরকার চা বোর্ড-এর মাধ্যমে চা-এর বাজার সম্প্রসারণ এবং চা-এর উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করছেন। বর্তমানে পানি সেচের সাহায্যে চট্টগ্রামে কয়েকটি নতুন চা বাগান তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশের চা শিল্পের ভবিষ্যৎ অতীব উজ্জ্বল।

বাংলাদেশের চিনি শিল্প

ভূমিকা ঃ বাংলাদেশের চিনি শিল্প কৃষিভিত্তিক। চিনিকলগুলো গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত। এজন্য গ্রামীণ অর্থনীতিতে এ শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। চিনি খাদ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে ৫টি চিনিকল ছিল। বর্তমানে ১৭টি চিনিকল রয়েছে।

বাংলাদেশে চিনি শিল্প গড়ে উঠার কারণসমূহ ঃ বাংলাদেশে চিনিকল গড়ে উঠার কতগুলো কারণ রয়েছে। চিনি উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল আখ। বাংলাদেশের উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় আখের উৎপাদন ভাল হয়। বাংলাদেশের উত্তর ও পশ্চিম অংশে আখ অধিক উৎপন্ন হয়। এজন্য সে অঞ্চলে চিনিকলগুলো অবস্থিত।

বাংলাদেশে চিনির চাহিদা রয়েছে। চিনিকলের জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। সরকারি উদ্যোগে অধিকাংশ চিনিকল স্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশে চিনি উৎপাদনে বেসরকারি উদ্যোগ সীমিত।

চিনি শিল্পের বণ্টন ঃ বর্তমানে বাংলাদেশে ১৭টি চিনিকল রয়েছে। এর মধ্যে "কেরু এন্ড কোম্পানি" ছাড়া বাকি ১৬টি জাতীয়করণকৃত। এ চিনিকলগুলো রাজশাহী বিভাগে ৯টি, ঢাকা বিভাগে ৫টি এবং খুলনা বিভাগে ৩টি অবস্থিত।

বাংলাদেশে চিনিকলের নাম ও অবস্থান নিচে দেয়া হলঃ

চিনিকলের নাম	যে জেলায় অবস্থিত তার নাম
পঞ্চগড় চিনিকল	পঞ্চগড়
ঠাকুরগাঁও চিনিকল	ঠাকুরগাঁও
সেতাবগঞ্জ চিনিকল	দিনাজপুর
শ্যামপুর চিনিকল	রংপুর
মহিমাগঞ্জ চিনিকল	গাইবান্ধা
নীলফামারী চিনিকল	নীলফামারী
জয়পুরহাট চিনিকল	জয়পুরহাট
কালিয়াচাপড়া চিনিকল	কিশোরগঞ্জ
দেওয়ানগঞ্জ চিনিকল	জামালপুর
হরিয়ান চিনিকল	রাজশাহী
নাটোর চিনিকল	নাটোর
গোপালপুর চিনিকল	নাটোর
জগতি চিনিকল	কুষ্টিয়া
দর্শনা চিনিকল	চুয়াডাঙ্গা
মোবারকগঞ্জ চিনিকল	ঝিনাইদহ
চরসিন্দুর চিনিকল	নরসিংদী
ফীরদপুর চিনিকল	ফরিদপুর

নিচের সারণিতে বাংলাদেশের চিনিকলের চিনির উৎপাদন দেখান হলঃ

চিনির উৎপাদন
(হাজার মেট্রিকটন)

সাল	উৎপাদন
১৯৯৪-৯৫	২৭০.১০
১৯৯৫-৯৬	১৮৪.০৫
১৯৯৬-৯৭	১৩৫.৩২
১৯৯৭-৯৮	১৬৬.৪৫
১৯৯৮-৯৯	১৫২.৯৮
১৯৯৯-২০০০	১২৩.৪৩

উৎস ঃ বাংলাদেশ মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন, আগস্ট- ২০০০, পৃ: ৬০

বাংলাদেশের চিনিকলের সমস্যা

১. বাংলাদেশ চিনিকলগুলো চাহিদা অনুযায়ী চিনি উৎপাদনে সক্ষম হচ্ছে না। বিদেশ থেকে চিনি আমদানি করে চিনির ঘাটতি পূরণ করতে হয়।
২. আখ সরবরাহের অনিশ্চয়তার কারণে চিনিকলগুলো পূর্ণ ক্ষমতা অনুযায়ী উৎপাদন করতে পারছে না।
৩. চলতি মূলধনের অভাবে কৃষকদের আখের দাম সময়মত পরিশোধ করতে না পারায় কৃষকেরা চিনিকলে আখ সরবরাহ না করে গুড় তৈরি করে।
৪. অধিকাংশ চিনিকলের যন্ত্রপাতি সেকেলে হওয়ায় উৎপাদন ব্যাহত হয়। উৎপাদন খরচ বেশি পড়ে।
৫. প্রতিবেশী দেশ থেকে সস্তায় চিনি আসার ফলে চিনিকলগুলো চিনি উচ্চমূল্যে বাজারজাত করতে পারে না।
৬. বিদ্যুৎ বিভ্রাটে চিনির উৎপাদন ব্যাহত হয়।
৭. প্রশাসনিক জটিলতার কারণে বাংলাদেশে চিনির উৎপাদন খরচ বেশি পড়ে। কৃষকদের নিকট থেকে উচ্চমূল্যে আখ ক্রয় করাতে খরচ বেশি পড়ে।
৮. আখ ক্ষেতগুলো দূরে থাকায় এবং সুষ্ঠু রাস্তাঘাটের অভাবে চিনিকলে আখ পরিবহন খরচ বেশি পড়ে।

চিত্র ৫ ঃ বাংলাদেশের চিনি শিল্প

সমস্যার সমাধান ঃ বাংলাদেশে একর প্রতি আখের ফলন কম। তাছাড়া আখ থেকে কম চিনি পাওয়া যায়। উচ্চমানের আখ উৎপাদনে কৃষকদের উৎসাহিত করতে হবে। রাস্তাঘাটের উন্নতি করে আখের পরিবহন খরচ কমাতে হবে। উৎপাদন মৌসুমে চিনিকলগুলোতে পর্যাপ্ত চলতি মূলধন সরবরাহ করার আবশ্যক। এতে করে চিনিকল কর্মৃপক্ষ কৃষকদের যথাসময়ে

আখের দাম পরিশোধ করতে পারবে। চিনিকল এলাকায় আখ উৎপাদনকারী কৃষকদেরকে গুড় উৎপাদনে নিরুৎসাহিত করতে হবে। এজন্য কৃষকদের সঙ্গে সমঝোতা করা প্রয়োজন। এতে করে তারা চিনিকলে আখের যোগান দিবে। প্রশাসনিক জটিলতা দূর করে এবং চিনিকল আধুনিকীকরণ করে চিনিকলগুলোর সমস্যা দূর করা যাবে।

উপসংহার ঃ চিনি শিল্পের প্রায় সকল উপাদান বাংলাদেশে বর্তমানে থাকা সত্ত্বেও চিনি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। অথচ আখের উৎপাদন বাড়াতে পারলে, গুড় তৈরির প্রবণতা দূর করতে পারলে এবং বিশেস করে জাতীয়করণকৃত মিল কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনা, সীমাহীন দুর্নীতি পরিহার করে সঠিক ব্যবস্থাপনায় চিনি উৎপাদন করলে চাহিদা অপেক্ষাও বেশি চিনি উৎপাদন করা সম্ভব। সুতরাং বাংলাদেশে চিনি শিল্পের ভবিষ্যত খুবই উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময়।

রচনা মূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের পাট শিল্পের বিবরণ দিন।
২. বাংলাদেশের কার্পাস বয়নশিল্পের বিবরণ দিন।
৩. বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের বিবরণ দিন।
৪. বাংলাদেশের সার শিল্পের বর্ণনা দিন।
৫. বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্পের বর্ণনা দিন।
৬. বাংলাদেশের কাগজ শিল্পের বর্ণনা দিন।
৭. বাংলাদেশের চা উৎপাদনের অনুকুল ভৌগলিক কারনসমূহ বর্ণনা করুন।
৮. বাংলাদেশের চিনি কলের সমস্যাগুলো কিকি? উক্ত সমস্যা কিভাবে দূর করা যায়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. জেলা ওয়ারী বাংলাদেশ পাট শিল্পের বন্টন দেখান। বাংলাদেশের পাট-শিল্পের সমস্যাগুলো কি কি।
২. বাংলাদেশে পাট শিল্প গড়ে উঠার কারণগুলো কি কি?
৩. কার্পাস বয়ন শিল্পের বণ্টন দেখান।
৪. বাংলাদেশের পোশাক শিল্প গড়ে উঠার কারণসমূহ কি কি?
৫. বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্পের বণ্টন দেখান।
৬. বাংলাদেশের কাগজ কলগুলোর নাম লিখুন।
৭. বাংলাদেশের সিলেট এলাকায় চা শিল্প গড়ে উঠার কারনগুলো কিকি?
৮. বাংলাদেশের চিনি শিল্পের সমস্যাসমূহ কিকি?

পাঠ- ৫ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের কুটির শিল্পে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- বাংলাদেশের কুটির শিল্পের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের সমস্যা সমাধানের উপায় বলতে পারবেন।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ঃ স্বল্প মূলধন ও সহজলভ্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে গৃহে পরিবারের লোকজন দ্বারা উৎপাদনকার্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করাকে কুটির শিল্প বলে। বাংলাদেশের শিল্প আইন অনুযায়ী, যে সকল শিল্পে ২০ জন এবং তার চেয়ে কম লোক কাজ করে তাকে কুটির শিল্প বলে। অপরিদিকে, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার মতে, যে সকল শিল্পে জমি ছাড়া বিনিয়োগের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকার অধিক নয় তাকে ক্ষুদ্র শিল্প বলে।

কুটির শিল্পের গুরুত্ব ঃ বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত: কৃষিভিত্তিক। এ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে কুটির শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। মোট দেশজ উৎপাদনে বৃহৎ শিল্পের অবদান মাত্র ৭.২% এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রায় ৪%। বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে কুটির শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। নিচে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কুটির শিল্পের গুরুত্ব আলোচনা করা হলঃ

১. **বেকার সমস্যার সমাধান ও দারিদ্র্য বিমোচন ঃ** বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৮৫ জন লোক গ্রামে বাস করে এবং ৮০% লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। অধিকাংশ লোকই দরিদ্র। কৃষিতে অধিক জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধির ফলে মৌসুমী ও ছদ্মবেশী বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। কুটির শিল্পে নিয়োজিত থাকলে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের দারিদ্র্য এবং মৌসুমী ও ছদ্মবেশী বেকারত্ব দূর হবে।

২. **মহিলাদের কর্মসংস্থান ঃ** আমাদের দেশে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মহিলা। বিভিন্ন কারণে মহিলারা কর্মহীন অবস্থায় দিন কাটায়। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য মহিলাদের উৎপাদনমূলক কাজে অংশ গ্রহণ প্রয়োজন। আমাদের দেশে ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে মহিলারা গৃহ থেকে দূরে কাজে যেতে চায় না। এমতাবস্থায় কুটির শিল্পে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। প্রত্যেক পরিবারে কুটির শিল্পের বন্দোবস্ত করা হলে মহিলারা ঘরে বসে উৎপাদনমূলক কাজে অংশ নিতে পারবে।

৩. **স্বল্প মূলধন ঃ** বাংলাদেশের পুঁজির স্বল্পতা আছে কিন্তু অল্প পুঁজি দ্বারা কুটির শিল্প স্থাপন করা যায়। এতে স্বল্প পুঁজির লোক উৎপাদনে অংশগ্রহণ করতে পারে।

৪. **সম্পদের সুষম বণ্টন ঃ** বৃহৎ শিল্পে অধিক মূলধন লাগে। ফলে বিত্তবানরা বৃহৎ শিল্পের মালিক হয় এবং সম্পদ তাদের কুক্ষিগত থাকে। পক্ষান্তরে, স্বল্প আয়ের লোকেরা কুটির শিল্পের মালিক হতে পারে। এতে তাদের আয় বাড়ে এবং সমাজে সুষম সম্পদ বণ্টন নিশ্চিত হয়।

৫. **কাঁচামালোর ব্যবহার ঃ** বাংলাদেশের কৃষিতে বিভিন্ন প্রকার কাঁচামাল উৎপন্ন হয়। বৃহৎ শিল্পের এসব কাঁচামাল সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পারে না। কুটির শিল্পের এসব কাঁচামাল ব্যাবহার করে দেশের দ্রুত উন্নতি করা যাবে।

৬. **দেশের সকল অঞ্চলে সুষম উন্নয়ন ঃ** বাংলাদেশের বৃহদায়তন শিল্পসমূহ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী প্রভৃতি মুষ্টিমেয় শহরে এবং বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে স্থাপিত। ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে এবং দেশের এক অঞ্চল ও অপর অঞ্চলের মধ্যে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু কুটির শিল্প দেশের গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র স্থাপন করে সুষম উন্নয়ন সম্ভব করা যায়।

৭. **রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ঃ** কুটির শিল্পে চাহিদা অনুযায়ী রুচিশীল ও সৌখিন দ্রব্য অতি সহজে উৎপাদন করা যায়। এসব দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব।

৮. **অতিরিক্ত আয়ের সংস্থান ঃ** বাংলাদেশের কৃষকেরা কৃষিকাজ ছাড়াও অবসর সময়ে বা যে সময়ে মাঠে কাজ থাকে না কুটির শিল্পে অংশ গ্রহণ করে অতিরিক্ত উপার্জন করতে পারে। এতে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে।

৯. **বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের পরিপূরক ঃ** কুটির শিল্প বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বৃহৎ শিল্পের অনুপূরক দ্রব্য, যন্ত্রাংশ তৈরি করে দিতে পারে। বৃহৎ শিল্পের উপজাত বা পরিত্যক্ত দ্রব্য কুটির শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

১০. **দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ** বৃহৎ ও কুটির শিল্প পরস্পরের প্রতিযোগী না হয়ে একযোগে দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

১১. **জাতীয় আয় বৃদ্ধি ঃ** কুটির শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করে জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা যায়।

১২. **স্বকর্মসংস্থান ঃ** বাংলাদেশে দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা দুই-ই প্রকট। প্রতিবছর নতুন নতুন কর্মপ্রার্থী বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সে অনুপাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। কুটির শিল্প স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ করে বেকার ও দারিদ্র্য বিমোচন করতে পারে।

উপসংহার ঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বি.আর.ডি.বি), গ্রামীণ ব্যাংক, বিভিন্ন এন.জি.ও; যেমনঃ ব্র্যাক, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, আশা প্রভৃতি সংস্থা গ্রামের মহিলা ও পুরুষদের ঋণ দিয়ে কুটির শিল্পের মাধ্যমে স্বকর্মসংস্থানের কর্মসূচি চালু করেছে।

কুটির শিল্পের সমস্যা

ভূমিকা ঃ "বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কুটির শিল্পের অবদান অপরিসীম হলেও বর্তমানে এ খাত নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত।"

কুটির শিল্পের সমস্যা ঃ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কুটির শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু বাংলাদেশের কুটির শিল্প নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন। এ সমস্যাগুলো নিচে আলোচনা করা হলঃ

১. **সনাতন বা গতানুগতিক উৎপাদন পদ্ধতি ঃ** অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কুটির শিল্পে গতানুগতিক বা সনাতন উৎপাদন পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপাদন করা হয় এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মান নিম্নমানের হওয়ায় বাজারজাত করার সমস্যা দেখা দেয়।

২. **শিক্ষা ও দক্ষতার অভাব ঃ** কুটির শিল্পের নিয়োজিত শ্রমিক ও কারিগরগণ অশিক্ষিত বা খুব অল্প শিক্ষিত। তাদের কারিগরি জ্ঞান নেই ফলে তারা অদক্ষ। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে তারা পরিচিত নয়।

৩. **মূলধনের অভাব ঃ** বাংলাদেশের কুটির শিল্পের মালিকেরা বেশির ভাগই দরিদ্র। মূলধনের অভাবে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে পারে না। এজন্য কুটির শিল্পের উন্নতি করতে পারা সমর্থ নয়।

৪. **ঋণের অভাব ঃ** বাংলাদেশের কুটির শিল্পীরা দরিদ্র। ব্যাংক থেকে সময়মত ও পর্যাপ্ত এবং সহজ শর্তে ঋণ না পাওয়ায় তারা কুটির শিল্পের উন্নতি করতে পারে না।

৫. **নিম্মানের পণ্য ঃ** কুটির শিল্পীরা অজ্ঞ, অদক্ষ। আধুনিক কারিগরি জ্ঞানের অধিকারী নয়। ফলে তারা নিম্নমানের পণ্য উৎপাদন করে।

৬. **কাঁচামালের অভাব ঃ** কাঁচামালের অভাবের জন্য কুটির শিল্পের উৎপাদন ব্যাহত হয়। কুটির শিল্পের মালিকগণ দরিদ্র, অজ্ঞ। তারা উচ্চমূল্যে বা বিদেশ থেকে সরাসরি কাঁচামাল ক্রয় বা আমদানি করতে পারে না। ফলে কাঁচামালের অভাবের জন্য উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৭. **বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাব ঃ** ছোট ছোট যন্ত্রপাতি বিদ্যুৎ দ্বারা পরিচালিত হলে উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া রাত্রিকালে অবসর সময়ে উৎপাদন করতে হলে ঐবদ্যুতিক আলোর প্রয়োজন। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ পর্যাপ্ত নয় এজন্য কুটির শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

৮. **ত্রুটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থা ঃ** কুটির শিল্পীরা পণ্যের বাজারজাতকরণের কৌশল জানে না। তাছাড়া পণ্যের বাজার বিস্তৃতিতে তারা সমর্থ নয়। উপরন্তু ফড়িয়া ও দালালদের চক্রান্তের ফলে তারা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়।

৯. **সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থার অভাব ঃ** অনেক গ্রামাঞ্চলে পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত নয়। ফলে কাঁচামাল সংগ্রহ ও পণ্যের বাজারজাতকরণে পরিবহন খরচ বেশি পড়ে এবং সময় বেশি লাগে।

১০. **বিদেশী পণ্যের আমদানি এবং বিদেশী পণ্যের প্রতি আকর্শণ ঃ** আমাদের দেশের লোকজনের বিদেশী পণ্যের প্রতি আকর্ষণ বেশি, বিদেশী পণ্যের অবাধ আমদানির ফলে কুটির শিল্পজাত পণ্য তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়।

১১. **অপর্যাপ্ত সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ঃ** পর্যাপ্ত সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে কুটির শিল্পের বিকাশ লাভ হচ্ছে না। ফলে অনেক কুটির শিল্প বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

উপরোক্ত সমস্যাসমূহ কুটির শিল্পের উন্নয়ন ব্যাহত করছে। একসময় বাংলার কুটির শিল্পের সুনাম ছিল। কুটির শিল্পের উন্নতিকল্পে এবং এর হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য এ সমস্ত সমস্যার সমাধান জরুরি হয়ে পড়েছে। নিচে এসব সমস্যার সমাধানের উপায় বর্ণনা করা হলঃ

কুটির শিল্পের সমস্যার সমাধান ঃ নিচের ব্যবস্থাগুলো অনুসরণ করলে এ শিল্পের বিদ্যমান সমস্যার সমাধান ও উন্নতি সাধন করা সম্ভব হবে।

১. **উৎপাদন পদ্ধতির আধুনিকীকরণ ঃ** বাংলাদেশের কুটির শিল্পে সনাতন বা গতানুগতিক উৎপাদন পদ্ধতির স্থলে আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রচলন করতে হবে। এজন্য বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) কুটির শিল্পীদের ট্রেনিং ও সহযোগিতার বন্দোবস্ত করবে। তাদেরকে কারিগরি জ্ঞান প্রদান করতে হবে।

২. **সাধারণ ও কারিগরি জ্ঞানের প্রসার ঃ** অশিক্ষিত গ্রামবাসী বিশেষত কুটির শিল্পীদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি জ্ঞানের প্রসার ঘটাতে হবে। এর ফলে তারা দক্ষ হবে, পণ্যের মান ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

৩. **পর্যাপ্ত ঋণ ও পুঁজির সরবরাহ ঃ** কুটির শিল্পের মালিকদের সহজ শর্তে পর্যাপ্ত ঋণ ও পুঁজির যোগান দিতে হবে। ঋণ ও পুঁজি পেলে তারা উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে পারবে।

৪. **কাঁচামালের সরবরাহ ঃ** কৃটির শিল্পের মালিকেরা দেশ ও বিদেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করতে পারে তার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। এর ফলে তারা শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারবে।

৫. **বিদ্যুৎ সরবরাহ ঃ** কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে।

৬. **বাজার ব্যবস্থার উন্নতি ঃ** দেশের অভ্যন্তরে গ্রামাঞ্চলে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত হলে কুটির শিল্পজাত পণ্যের বাজার বিস্তৃত হবে। ফড়িয়া ও দালালদের হাত থেকে তারা রক্ষা পাবে।

৭. **কুটির শিল্পজাত পণ্যের জনপ্রিয়তা সৃষ্টি ঃ** কুটির শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা দেশে ও বিদেশে বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। দেশবাসীকে এসব পণ্যের ব্যবহার করার জন্য উৎসাহ ও প্রেরণা দিতে হবে।

৮. **সরকারি উদ্যোগ ঃ** বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কুটির শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। দারিদ্র্য বিমোচনে এ শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এজন্য এ শিল্পের উন্নতির জন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। বিসিক ও অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে সরকারকে প্রশিক্ষণ, কারিগরি শিক্ষাদান, বিদেশে এ পণ্যের বাজার সৃষ্টি প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের কুটির শিল্পগুলো কি কি?

২. বাংলাদেশের কুটির শিল্পগুলো গুরুত্ব লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বর্ণনা দিন।

পাঠ- ৬ বাংলাদেশের শিল্পায়নে সরকারী ও বেসরকারী খাতের ভূমিকা ও বেসরকারী করণের প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের শিল্পায়নে সরকারী ও বেসরকারী খাতের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- বেসরকারীকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

সরকারী ও বেসরকারী খাতের ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতি মিশ্র অর্থনীতি অর্থাৎ অর্থনীতিতে সরকারী খাত ও বেসরকারী খাত উভয়ের ভূমিকা রয়েছে। সাম্প্রতিককালে বেসরকারী খাতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদন ও বন্টনে সরকারী খাতের ভূমিকা সীমিত বা অনুপস্থিত, বেসরকারী খাতের ভূমিকাই প্রধান। অর্থনীতির কয়েকটি খাত, যেমন- ১. অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, ২. আণবিক শক্তি, ৩. বিমান পরিবহন, ৪. টেলিযোগাযোগ, ৫. বন সম্পদ আহরণ সরকারী খাতের জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট সকল খাত বেসরকারী খাতের জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট সকল খাত বেসরকারী খাতের বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। অর্থনীতির এই সামগ্রিক নীতির প্রেক্ষাপটে শিল্পখাতে ও সরকারী খাত ও বেসরকারী খাতের ভূমিকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

প্রতিরক্ষা সংশ্লিষ্ট খাত ব্যতীত শিল্পখাতের অন্য কোন উপ-খাতই সরকারী খাতের জন্য সংরক্ষিত করা হয়নি। অর্থাৎ শিল্পখাতের উন্নয়নের জন্য উৎপাদন ও বন্টনে সরকারী খাতের প্রত্যক্ষ ভূমিকা অপরিহার্য নয় বলে মনে করা হয়। দেশের শিল্পায়নে বেসরকারী খাত প্রায় সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে। এর কারণ তুলনামূলকভাবে বেসরকারী খাত অধিক দক্ষ।

শিল্প দ্রব্য উৎপাদন ও বন্টনে সরকারী খাতের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতির অর্থ অবশ্য এ নয় যে, দেশের শিল্পায়নে সরকারী খাতের কোন ভূমিকা নেই। বরং মনে করা হয় যে, শিল্পায়নে সরকারী খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু এ ভূমিকা হবে সহায়ক ভূমিকা নিয়ন্ত্রক বা প্রত্যক্ষ উৎপাদকের ভূমিকা নয়। ব্যক্তিগত খাতের উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু সরকারী নীতিমালা এবং পর্যাপ্ত সহায়ক সেবার প্রয়োজন যেগুলো বেসরকারী খাত সরবরাহ করতে সক্ষম নয়। পর্যঅপ্ত বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ, উন্নত যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, দক্ষ বন্দর সেবা, দক্ষ আর্থিখ ব্যবস্থা, অনুকূল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং সুশাসন দেশের শিল্পায়ন তথা উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। সরকারী খাত এসব সেবা দক্ষভাবে সরবরাহ করে দেশের শিলায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বেসরকারীকরণের প্রয়োজনীয়তা

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশের শিল্পখাতের অধিকাংশ বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয়। এর ফলে সরকার বৃহদায়তন শিল্পের স্থায়ী সম্পদের শতকরা ৯২ ভাগের মালিকানা লাভ করে। দুটি পরস্পর সম্পর্কিত কারণে শিল্প জাতীয়করণ করা হয়। প্রথমত, দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতার যুদ্ধ পরবর্তী অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক আদর্শে গঠনের সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার পূর্বে আধুনিক শিল্পখাতের অধিকাংশের মালিকানা ছিল পাকিস্ত ানীদের হাতে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে তারা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের উচ্চ ব্যবস্থাপনার সকলে দেশ ত্যাগ করে গেলে এসব প্রতিষ্ঠানে চরম শূন্যতা দেকা দেয়। বাংলাদেশী ব্যক্তিগত খাত ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং এসব শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অনভিজ্ঞ ও অক্ষম। এ পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু রাখার উদ্দেশ্যেও তা জাতীকরণ করা হয়। এছাড়া ব্যক্তিগত খাতে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত করে দেয়া হয়।

জাতীয়কৃত শিল্পখাতের কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, দুর্নীতি, দুর্বল ব্যবস্থাপনা, উগ্র শ্রমিক সংঘ, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ইত্যাদি কারণে অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠান লোকসানের সম্মুখীন হয় এবং লোকসানের পরিমাণ প্রতিবছর বাড়তে থাকে। সরকারী খাতের এই লোকসান সরকারের বাজেট থেকে কিংবা ঋণ করে পূরণের চেষ্ট করা হয়। এর ফলে সরকারের অন্যান্য জরুরী কার্যক্রম অর্থায়নের সংকট দেখা দেয় এবং আর্থিক খাতেও চাপ অনুভূত হয়। এ পরিস্থিতিতে সরকার জাতীয়কৃত শিল্প বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৯৮২ সালের শিল্পনীতিতে এ শিদ্ধান্ত প্রতিফলিত হয়। এর পরবর্তীকালের শিল্পনীতিগুলোতেও এ সিদ্ধান্ত অব্যাহত থাকে। সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় ও বৈদেশিক ব্যক্তিগত খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নানাবিধ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয় এবং সরকারী খাতের নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে সহায়ক ভূমিকা কার্যকরী হয়।

সরকারের উন্নয়ননীতি হচ্ছে ব্যক্তিগত খাত পরিচালিত প্রবৃদ্ধি। এমতাবস্থায় উৎপাদন ও বন্টন ক্ষেত্রে সরকারী খাতের বড় ভূমিকা হবে সরকারের মৌল নীতির বিরোধী। এজন্যও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পের বেসরকারীকরণ প্রয়োজনে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। নিচের কোন খাতটি সরকারী খাতের জন্য সংরক্ষিত?
ক. কৃষি
খ. শিক্ষা ও স্বাস্থ্য
গ. অস্ত্র, গোলাবারুদ ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম
ঘ. উপরের কোনটিই নয়

২। দেশের শিল্পায়নে সরকারী খাতের ভূমিকা হবে-
ক. সহায়কের ভূমিকা
খ. নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা
গ. প্রত্যক্ষ উৎপাদকের ভূমিকা
ঘ. উৎপীড়কের ভূমিকা

৩। বাংলাদেশে বর্তমানে পাটকলের সংখ্যা-
ক. ৪০টি
খ. ৭৭টি
গ. ৩৭টি
ঘ. ৮৭টি

৪। পাটজাত দ্রব্যের শতকরা কত ভাগ বিদেশে রপ্তানি হয়?
ক. ৮৫ ভাগ
খ. ৮০ ভাগ
গ. ৭৫ ভাগ
ঘ. ৯০ ভাগ

৫। বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের অধিকাংশই রপ্তানি হয়-
ক. আমেরিকা ও কানাডায়
খ. ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভুক্ত দেশসমূহ
গ. সি আই এস ভূক্ত দেশসমূহ
ঘ. (ক) ও (খ)

৬। বাংলাদেশে বর্তমানে চা বাগানের সংখ্যা কয়টি?
ক. ১৮৫টি
খ. ১৪৮টি
গ. ১৬৮টি
ঘ. উপরের কোনটি নয়

৭। বাংলাদেশের কোন রপ্তানি আন্তর্জাতিক চাহিদা ক্রমশ: কমে যাচ্ছে?
ক. পাটজাত দ্রব্য
খ. চিনি
গ. তৈরি পোশাক
ঘ. চামড়া

৮। পরিবর্তনশীল যোগান কোন শিল্পের সমস্যা?
ক. চামড়া
খ. চা
গ. পাট
ঘ. উপরের সবকটি

৯। বাংলাদেশের কোন শিল্পের আমদানি নির্ভরশীলতা সবচেয়ে বেশি?
ক. কাগজ
খ. চিনি
গ. তৈরি পোশাক
ঘ. সিমেন্ট

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. দেশের শিল্পায়নে সরকারী ও বেসরকারী খাতের ভূমিকা সংক্ষেপে লিখুন।
২. বাংলাদেশে শিল্প বেসরকারীকরণের প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে লিখুন।
৩. পাটশিল্পের সমস্যা ও সমাধানের উপায় সংক্ষেপে লিখুন।
৪. পোশাক শিল্পের সমস্যা ও সমাধানের উপায় সংক্ষেপে লিখুন।
৫. চা শিল্পের সমস্যা ও সমাধানের উপায় সংক্ষেপে লিখুন।